

25 ভাল করা

ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিকল্পনার অনুশীলন চলছিল। একদিন ইনস্টিটিউটের টি ক্লাবে কিছু তরুণ অনুসন্ধিৎসু অধ্যাপক সেখানে বসে থাকা তাঁদের কয়েকজন প্রবীণ সহকর্মীদের অনুরোধ করলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ভাগ করে নিতে—কীভাবে ইনস্টিটিউটের শিক্ষা এবং গবেষণার কাজে আরও গতি আনা যায়। প্রবীণ সহকর্মীদের একজন, অধ্যাপক চিদাম্বরম, তখন নিচের গল্পটি বললেন।

“প্রায় ২০ বছর আগে আমি এই ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলাম, দেখতে যে কীভাবে একটি জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আমি নিজে ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেছি। মনে রাখতে হবে, যে সেই ইনস্টিটিউট তখন রীতিমতন প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেহেতু আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে একাডেমিক জীবনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করব কি না এবং ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ কী হবে, তাই আমি এখানে ডেপুটেশনে এসেছিলাম। কাজে যোগ দেবার পরে আমি লক্ষ্য করলাম যে ইনস্টিটিউটের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগে এমন সব কিছুই রয়েছে: মার্কেটিং (প্লেসমেন্ট), ফাইন্যান্স (তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার), মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (শিক্ষক ও কর্মচারী), অপারেশনস (পিজিপি ও অন্যান্য প্রোগ্রাম চালানো), প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। ইচ্ছে করলেই এর যেকোনো একটি বা একাধিক কাজে কেউ যোগ দিতে পারতো, শিল্পক্ষেত্রের মতো অত চাপ ছাড়াই। দুই বছর পর আমি তাই স্থায়ী পদে যোগ দিতে সম্মতি দিলাম।

“আমি প্রথম ব্যাচের পিজিপি শিক্ষার্থীদের তিনটি টার্মে তিনটি ভিন্ন বিষয় পড়াতাম: বিজনেস পলিসি (যা এখন স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত), ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম (যা সাধারণত অন্য ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে ফাইন্যান্স বিভাগে পড়ানো হতো) এবং ম্যানেজমেন্ট অব চেঞ্জ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি (যা অন্য জায়গায় সাধারণত বিহেভিয়ারাল সায়েন্স বিভাগে পড়ানো হতো)। আমাকে প্লেসমেন্টের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ডিরেক্টর সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি কি না। আমি আমার সমস্যার কথা বললাম: “যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে যে আমি যা পড়াই তা বাস্তবে করা সম্ভব, তবে আমার তা পড়াতে সত্যিই খুব অসুবিধা হয়,” বললেন ড. চিদাম্বরম।

ডিরেক্টর হাসলেন এবং মাথা নাড়লেন।

এই সমস্যাটির সমাধান করতে ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল সেই বছর সিদ্ধান্ত নিলো যে অধ্যাপক চিদাম্বরমকে তাঁর প্রথম কোর্সের জন্য কেস ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে বলা হবে। যেহেতু লখনউতে খুব বেশি কোম্পানি ছিল না, অধ্যাপক চিদাম্বরম স্কুটারস ইন্ডিয়া লিমিটেড নিয়ে তিন-পর্বের একটি কেস স্টাডি তৈরি করলেন এবং বিশ্বাসের সাথে দেখলেন যে তাঁকে তাঁর ডক্টরাল কোর্সে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যা শেখানো হয়েছিল তা এই কেস পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। “কীভাবে একটি কোম্পানি প্রায় সব কার্যকরী ক্ষেত্রে ভুলভাবে পরিচালিত হতে পারে, অথচ প্রায় ১৬ বছর ধরে ক্রমাগত ক্ষতির পর ক্ষতি করে খরচ কমাতে অক্ষম হয়ে টিকে থাকতে পারে?” এই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর মনে বেশ একটা কৌতূহল জাগলো।

ইনস্টিটিউট সেই সময় এমনকি বেতনের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। “দ্বিতীয় বছরে আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আমরাও হয়তো সেই একই পথে যাচ্ছি,” অধ্যাপক চিদাম্বরম বললেন।

“আমি তখনও ঠিক জানতাম না কীভাবে সমস্যাটির সমাধান করা যায়, তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কোনো না কোনো উপায় অবশ্যই আছে। আমি যে বিষয়গুলো পড়াই, সেগুলো কি কোনো সমাধান দিতে পারে না?” তিনি ভাবলেন। “সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন ‘শেপিং দ্য ফিউচার’ নামে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম ‘কমিটি অন ফিউচার ডিরেকশনস’-এর সদস্য হিসেবে। এক ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল মিটিংয়ে যখন আমরা সকলে চা-আসবার অপেক্ষাতে, সেই সময় আমাদের সহকর্মী এক অধ্যাপক হঠাৎ এই কমিটির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কমিটির রিপোর্টটি ছিল মোট ৮৪ পৃষ্ঠার — ১২ পৃষ্ঠা ‘আমরা কী হতে চাই’ নিয়ে এবং বাকি ৭২ পৃষ্ঠা ‘কীভাবে তা হওয়া যায়’ এই নিয়ে। ‘অতিরিক্ত বড়’ হওয়ায় সদস্যরা এটিকে পড়ার যোগ্য মনে করেননি, কিছু বিশেষজ্ঞ সদস্য মনে করতেন যে ‘পার্সপেকটিভ প্ল্যান এক থেকে দুই পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয়’। যদিও আমি রিপোর্টটি বিজনেস পলিসির একজন কৌতূহলী ছাত্র হিসেবে লিখেছিলাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে প্রস্তাবিত পথে সত্যিই কাজ হবে কি না,” তিনি যোগ করলেন।

“দ্বিতীয় বছরের শেষে আমি অ্যাপোলো হাসপাতাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড নিয়ে একটি কেস লেখার কাজ হাতে নিলাম। এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ থেকে ফিরে আসার পর আমি ক্রমশই নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে আমাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথে যেতে হবে, যাতে সরকারের উপর নির্ভরতা কমে, আমাদের নিজেদের উপর আর্থিক চাপও কমে। যদি অ্যাপোলো নিজেই এসব করতে পারে, তবে আমরাই বা কেন তা পারব না, বিশেষ করে যখন চ্যালেঞ্জগুলো একই ধরনের? যখন আমি দেখলাম যে ৩০ জুলাই, ১৯৮৮ তারিখে আমাদের সেই মাসের বেতন অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি কারণ মন্ত্রণালয় থেকে চেক আসতে দেরি হয়েছে, তখন আমি অনুভব করলাম যে হয়তো আমাদের সময় সত্যিই ফুরিয়ে আসছে,” বললেন ডক্টর চিদাম্বরম। ইনস্টিটিউটের তখনও শৈশবকাল, মাত্র চার বছরের পুরনো। ইনস্টিটিউটে তখন খুব অল্পসংখ্যক অধ্যাপক ছিলেন এবং ইনস্টিটিউটের নিজস্ব পরিকাঠামো সামান্য বলতে কিছু ছিল না, ধার করে বা ভাড়া নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছিল। সরকারী পয়সা আসছিল খুবই ধীরগতিতে। ইনস্টিটিউটে লোকজনের কাজকন্মতেও কোনো ভারসাম্য ছিল না, অল্প কয়েকজনের ঘাড়ে সব কাজের ভাঁড় আর বাকিরা সকলে ফাঁকা, ফলে দলাদলি মন-কষাকষিও চলছিল বেশ ভালোভাবেই।

১৯৮৯ সালের আগস্টে একজন নতুন ডিরেক্টর কাজে যোগ দিলেন ইনস্টিটিউটে। আমি তাঁর সহশক্তির প্রশংসা করব, কারণ আমার সাদামাটা সতী কথাটা – ‘কেন এই ইনস্টিটিউট তার পিজিপি-তে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ৩০ থেকে ১০০-তে বাড়তে পারছে না?’ – তিনি সহজভাবেই নিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, যদি আমার কোনো সহকর্মী অধ্যাপক আমাকে বারবার এমন প্রশ্ন করত, তাহলে আমি বিরক্ত হতাম, অথচ তিনি কিন্তু সব হাসিমুখে সহ্য করে নিলেন। তবে একদিন, ১৯৯১ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে, তাঁর ধৈর্য ভেঙে গেল এবং তিনি ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল মিটিংয়ে বললেন যে তিনি আমাকে পরবর্তী পিজিপি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করতে যাচ্ছেন! হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল যে এটাই আমাকে চুপ করানোর একমাত্র উপায়,” হাসতে হাসতে বললেন অধ্যাপক চিদাম্বরম। কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন পিজিপি চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারে অফিসে আদেশপত্র জারি হলো। সাধারণত এই আদেশপত্র আসতো এপ্রিলের মাঝামাঝি। ১ জুলাই, ১৯৯১-এ পঞ্চম ব্যাচে ইনস্টিটিউটে ১০৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলো, যেখানে আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০।

অনেক কাজ করতে হতো তখন আমাদের: ক্লাসরুমগুলোকে নতুন করে সাজানো (ছোট বিশেষ চেয়ার তৈরি করা হয়েছিল বাড়তি ব্যাচের জন্য), হোস্টেলের কাজ, ডাইনিং রুমের সুবিধা-অসুবিধে দেখা, কম্পিউটার সেন্টার তৈরী, চার মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের কাজ। শেষে কিন্তু সবকিছুই ঠিকঠাক

দাঁড়িয়ে গেল। ২৫ দিনের মধ্যে ১২০ আসনের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করিয়ে নেওয়া ছিল আমার জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বাড়তি ছাত্রসংখ্যা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালীন ও চাকরির প্লেসমেন্টও বেশ ভালোভাবে সম্পন্ন হলো সে বছর।

আরও অনেক কিছু ঘটল পাশাপাশি। কঠোর যুক্তিবোধের আশ্রয় নিয়ে পিজিপি ফি ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,৬৫০ টাকা করা হলো—যাতে খরচ মেটে এবং এক এক ব্যাচে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ১৮০ হলে ইনস্টিটিউটের আর সরকারি অনুদানের প্রয়োজন না হয়। খরচও কমানো হলো পাশাপাশি। নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক কমানো হলো না, তবে ফেরতযোগ্য ভিত্তিতে দেওয়া হলো ছাত্রদের যাতে দুই বছরের মধ্যে খরচ মেটে। পিজিপি হোস্টেল খরচ মাসে ৮০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০০ টাকা করা হলো এবং প্রকৃত খরচ অনুযায়ী ধার্য করা হলো, যেখানে আগে মাসে ১৫০ টাকা নেওয়া হতো। কনভোকেশনের খরচ মেটাতে একটি কনভোকেশন ফি চালু করা হলো, যাতে মন্ত্রণালয়ের অনুদান থেকে এই টাকা খরচ করতে না হয়। বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে পরামর্শ করে প্লেসমেন্ট ফি চালু করা হলো (সম্পদ তৈরি করতে খরচ-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য)। এসবের অনেক কিছু পরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও গ্রহণ করেছিল।

অভিভাবক ও কোম্পানির পাশাপাশি অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অবদানও বাড়ানো হলো। ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে প্রত্যেক অধ্যাপক প্রতি বছর অন্তত দুটি থেকে তিনটি কোর্স পড়বেন, যা পরে অন্যান্য আইআইএম-এও প্রচলিত হলো। পিজিপি ভর্তি তিনগুণ বাড়লেও কর্মচারী সংখ্যা বাড়ানো হলো না, যাতে খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকে। পাঁচ দিনের ক্লাস থেকে ছয় দিনের ক্লাস চালু করা হলো, যাতে সময়সূচি কাজের সাধারণ যুক্তি মেনে তৈরী হয় এবং পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও যথেষ্ট অবসর সময় পায়। অনেক নতুন অধ্যাপক যোগ দিলেন কাজে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলেন।

ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও, লাইব্রেরি ও পরিচয়পত্র রেজিস্ট্রেশনের সময় সরাসরি দেওয়া শুরু হলো। আগে এসব দিতে কয়েক সপ্তাহ লাগত। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ১৬ পৃষ্ঠা থেকে কমিয়ে ৪ পৃষ্ঠা করা হলো, যাতে প্রক্রিয়াটি আরও দ্রুত হয়। পরবর্তী ব্যাচ থেকে পিজিপি ম্যানুয়াল চালু হলো। ফরম্যাটেড অ্যাকসেসপেন্টস ফর্ম চালু হলো এবং অপেক্ষমান তালিকায় থাকার জন্যও গ্রহণযোগ্যতা চালু হলো। অ্যাকসেসপেন্টস ফি ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হলো, যাতে ড্রপআউট-জনিত ক্ষমতার অপব্যবহার কমে। প্রথমবারের মতো কাস্টমাইজড ভর্তি অফার পাঠানো হলো, যেখানে আগে নাম পেস্ট করা সাইক্লোস্টাইলড চিঠি পাঠানো হতো।

অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটল এই সময়। কোর্স ম্যাটেরিয়ালের জন্য জেরক্স চালু হলো, যাতে চাপ সামলানো যায় ও খরচ কমে। পিজিপি অফিসে কম্পিউটার চালু হলো এবং পরে এর পাশাপাশি অন্যান্য অফিসেও। অতিরিক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর না নিয়ে, সেক্রেটারিয়াল কর্মীদের কম্পিউটার-ভিত্তিক কাজে লাগানোর জন্য তাদের সুযোগসুবিধা বাড়ানো হলো। পরের বছর অধ্যাপকেরা ব্যক্তিগত কম্পিউটারও পেলেন। সে বছরের ব্যাচ পাশ করে বেরিয়ে যাবার পর অধিকাংশ কর্মচারী একটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট পেলো, প্রমোশনও হলো অনেকের। কাজের পরিমাণ অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত করবার ফলে শিক্ষকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও কমে গেল অনেক।

বাড়তি ছাত্র সংখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকার ইনস্টিটিউটকে একটি বিশাল পরিমানের অনুদান দিলো যাতে নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য। সপ্তম ব্যাচ থেকে ইনস্টিটিউট নতুন ক্যাম্পাসে কাজ করা শুরু করলো, মোট ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য। সবকিছুই চলছিল বেশ ভালোভাবে, যদিও দিনে ১৮-২০ ঘণ্টা কাজ করার ফলে প্রথম বছরের শেষে আমাদের শরীর ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিল একেবারে।

একদিন বেশ বিরক্ত হয়ে ডিরেক্টর চিদাম্বরমকে ফোন করে বললেন, “দেখুন! আপনি আমার জন্য সমস্যা কী সব সমস্যা তৈরি করছেন! আমি কি আপনাকে বলিনি ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে? এখন আপনি এ-জি অফিসের অডিটরদের উত্তর দিন। (পুরো পাঁচ বছরের অডিট করছিলেন এনারা!), এনারা বলছেন আমাদের প্লেসমেন্ট তো ঠিক আছে। আমরা পঞ্চম বছরে ভর্তি সংখ্যা ৩০ থেকে ১০০-র বেশি করেছি সফলভাবে, আর আমাদের কিনা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কেন আমরা আগে এটা করিনি?”

ডক্টর চিদাম্বরমও বিরক্ত হলেন বেশ। ভাবলেন যে যথাযথভাবে তাঁর পরিশ্রমের মূল্য দেওয়া হচ্ছে না, তবে এর পাশাপাশি তিনি এটাও ভাবলেন যে কেন অন্যান্য শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিগত ১৫ বছরে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে একটি আসনও বাড়ায়নি, কেনই বা তাঁদের ইনস্টিটিউটও আগে এই কাজ করেনি এবং কবেই বা আবার ভবিষ্যতে লাফ দেবার সময় আসবে!